বাংলাদেশ: শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতায় জড়িতদের জবাবদিহিতা এবং আহতদের সহায়তা নিশ্চিত করুন

বাংলাদেশ,
নভেম্বর ১২, ২০২৪

সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশের সদ্য বিপ্লবে নিরাপত্তা বাহিনী ও রাজনৈতিক দলের সদস্যরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল। এই হত্যাকাণ্ডে দায়ীদের বিচারের মুখোমুখি করার পাশাপাশি আহত প্রতিবাদকারীদের সহায়তা প্রদানের জোর দাবি উঠেছে

(ঢাকা, নভেম্বর ১২, ২০২৪)– বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে আন্দোলনকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনী এবং সরকারি পাহারাদারদের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে, জানিয়েছে **Fortify Rights** । একইসঙ্গে নিহতদের পরিবার এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে। **Fortify Rights** দুই মাসব্যাপী অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী এবং ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন শাসক দল আওয়ামী লীগের সদস্যরা প্রতিবাদ দমনের সময় হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতায় জড়িত ছিল।

“সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সহিংসতার মূল পরিকল্পনাকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত,” বলেছেন Fortify Rights এর পরিচালক John Quinley। “অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সহিংসতার শিকার এবং নিহতদের পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করতে হলে, এই সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম এবং নির্যাতনসহ অতীতের অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।”

২০২৪ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে, **Fortify Rights** চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং ঢাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর বিগত সরকারের দমন-পীড়নের শিকার ৪৪ জন বেঁচে

থাকা ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শী এবং সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। **Fortify Rights** পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), এবং আওয়ামী লীগসহ দলটির ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রলীগ' ও যুব সংগঠন 'যুবলীগ' কর্তৃক সংগঠিত হত্যাকাণ্ড ও সহিংসতা নথিভুক্ত করে।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, জুলাই ও আগস্ট মাসে আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ঘটনায় ১,০০০ জনেরও বেশি হত্যাকাণ্ড নথিভুক্ত করেছে।

Fortify Rights এর তদন্তে জানা গেছে, অনেক ঘটনায় পুলিশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ২১ জুলাই, রবিবার ঢাকায় ডেমরার সাইনবোর্ড এলাকার কনাপাড়ায় একদল পুলিশ সদস্য ২২ বছর বয়সী তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র সাজেদুর রহমান ওমরকে গুলি করে হত্যা করে। ইন্টারনেট দোকানে কর্মরত ২০ বছর বয়সী সাজেদুরের এক বন্ধু, যিনি সেদিন তার পাশে ছিলেন, জানান, "সেদিন দুপুরে আমরা আন্দোলন শুরু করি। আমরা ছিলাম মাত্র ৬০ জন, বেশিরভাগই ছাত্র এবং কিছু তরুণ।"

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন:

> পুলিশ একটি নির্মাণাধীন দশতলা ভবন থেকে অনেক দূরে ছিল। আমি অবাক হলাম যে তারা এত দূর থেকে গুলি চালাতে সক্ষম। ... আমরা ভাবিনি তারা ওই দিন আমাদের উপর গুলি চালাবে, তাই আমরা এগিয়ে গেলাম। তারপর তারা পাঁচ-ছয় রাউন্ড গুলি চালাল। এরপর পাঁচ মিনিটের বিরতি দেয়। পরে, তারা তীব্র গুলি চালানো শুরু করল। পুলিশ শুধু গুলি চালিয়েই যাচ্ছিল। আমরা কোনমতেই আহতদের সাহায্য করতে সামনে এগোতেও পারছিলাম না। আমি শুধু আমার বন্ধুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যেতে দেখলাম। গুলির আওয়াজ প্রায় অবিরত ছিল। [সাজেদুর রহমান ওমর] আমার ঠিক পাশেই ছিল। আমি একটি ছোট দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম এবং দেখলাম গুলি তার মাথায় লাগল, এরপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু গুলি চলতে থাকায় আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে পারলাম না।আরেকজন ছেলে আমাকে টেনে গুলির আওতা থেকে সরিয়ে নেয়।

২০ বছর বয়সী এই সাক্ষীর মতে, পুলিশ চারজনকে গুলি করেছিল, তবে শুধুমাত্র সাজেদুর রহমান ওমর নিহত হন।

সেদিন সাজেদুরের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের এক বন্ধুও, ২২ বছর বয়সী ছাত্র, আন্দোলনে গিয়েছিল। পুলিশের গুলিবর্ষণ, তার বন্ধুর হত্যা এবং কতিপয় আহতদের সেই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেনঃ

> দুপুর ১টা ৫ মিনিটের দিকে হঠাৎ, প্রায় ১৫০ মিটার [প্রায় ৪৯০ ফুট] দূরের একটি উঁচু ভবন থেকে গুলি শুরু হয়। [পুলিশ] প্রায় ১৫ রাউন্ড গুলি চালায়। ভীত হয়ে মানুষজন দৌড়ে পালায়। ... প্রায় ১৫ মিনিট পরে, তারা আবার গুলি চালায়, ২৫-৩০ রাউন্ড হবে। আমরা নিরাপদে থাকার জন্য প্রায় ৩০ মিটার [প্রায় ৯৮ ফুট] দূরে সরে যাই। পরিস্থিতি শান্ত মনে হলে আমরা [রাস্তা পার হয়ে] নদীর ঘাটের দিকে ফিরে যাই।
>
> আমি ওমরকে বলছিলাম, পরিস্থিতি ভালো নয়, কিন্তু সে আমাকে হাত ধরে শান্ত থাকতে বলল। এরপর আবার গুলি শুরু হয়, এবার হয়তো আট রাউন্ড। আমি পালিয়ে যাই। আর ওমর অন্যদের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। আমি একটি গলিতে ঢুকে পড়ি এবং মূল সড়কে তার দেহ পড়ে থাকতে দেখি। আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকতেই আরও চার-পাঁচ রাউন্ড গুলি চলে। আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হয়। একজনের পায়ে এবং আরেকজনের মাথায় গুলি লাগে। ওমর পড়েই ছিল। তারপর গুলি থেমে যায়। আমরা তাকে ২৫০ মিটার [প্রায় ৮২০ ফুট] দূরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।

সাক্ষী আরও জানান, দুটি সরকারি হেলিকপ্টার আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে শব্দ বোমা নিক্ষেপ করে। ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "গুলির আগে, বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ কেউ পতাকা ও সাইনবোর্ড হাতে ধরে ছিল। কেউ সহিংসতা প্রদর্শন করছিল না। কেউ পাথর ছুঁড়ছিল না। আমি জানি না কেন তারা গুলি চালালো।"

নির্যাতনের শিকার শুধু প্রতিবাদকারীরা ছিলেন না; নিরীহ পথচারীরাও এই সহিংসতার শিকার হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ৪১ বছর বয়সী এক নারী **Fortify Rights** কে জানায় কিভাবে নিরাপত্তা বাহিনী ১৯ জুলাই ২০২৪ সালে ঢাকার ধানমন্ডি ৩ নম্বর এলাকায় তার ১৬ বছর বয়সী ছেলে মোহাম্মদ শুভকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাটি ঘটেছিল তাদের রিকশা মেরামতের দোকানের কাছে। তিনি বলেন:

> বিকেল প্রায় ৩টার দিকে, ধানমন্ডি ৩ নম্বর চৌরাস্তার কাছে প্রচুর টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হচ্ছিল। আমি আকাশে একটি হেলিকপ্টারকে গুলি চালাতে দেখেছি। হেলিকপ্টারটি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করছিল এবং তাজা গুলিও চালাচ্ছিল। রাস্তায় নারীরা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ করছিলেন। একজন মহিলা আন্দোলনকারী আহত হলে আমার ছেলে তাকে উদ্ধার করে চৌরাস্তার পুলিশ বক্সে নিয়ে যায়। এ সময় রাস্তার ওপারে আমি আমার ছেলেকে দেখতে পাই। কিছুক্ষণ পর আমি তাকে হাইওয়ের ওপারে বিক্ষোভকারী কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে দেখি। এরপর হঠাৎ আমার ছেলের মাথায় গুলি লাগে। আমি গুলির শব্দ শুনতে পাই।

তিনি আরও বলেন: "ঘটনাস্থল আমার থেকে মাত্র ৪০-৫০ মিটার দূরে ছিল। আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম, একজন আন্দোলনকারী তার মাথায় একটি রক্তমাখা টি-শার্ট চেপে ধরে আছে।" মা দ্রুত ছেলের কাছে ছুটে যান। "পুলিশ তখনও গুলি চালাচ্ছিল। হেলিকপ্টার থেকেও গুলি চলছিল। আমি আমার স্কার্ফ খুলে আমার ছেলের মাথার রক্তক্ষরণ থামানোর চেষ্টা করি। আঘাতের জায়গায় কাপড়টি চিপে ধরে ছিলাম।"

ফোর্টিফাই রাইটসের কাছে থাকা ছবিগুলিতে দেখা গেছে, মোহাম্মদ শুভর মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, এবং তার মৃত্যু বন্দুকের গুলির আঘাতেই হয়েছে।

আরেকটি ঘটনায়, **Fortify Rights** চারজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, যাদের মধ্যে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তারা বর্ণনা করেছেন কিভাবে পুলিশ ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাস স্টেশন এলাকায় ১৯ বছর বয়সী মাহমুদুর রহমান শৈকতের মাথায় গুলি চালায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী হলেন দোকানের মালিক, যিনি সৈকতের সাথে নিয়মিত ফুটবল ও ক্রিকেট খেলতেন, বলেছিলেন:

> প্রায় ২৫ জন পুলিশ নূর জাহান মসজিদের দিকে এগিয়ে আসলে আমরা ছোট ছোট গলিগুলোতে ঢুকে পরি। পুলিশ গুলি চালায়। কেউ কেউ চোখে গুলিবিদ্ধ হয়। এই সময় আমার কুনইয়ে গুলি লাগে। পুলিশ এতো গুলি চালায় যে আশে পাশের ভবনগুলিতে আঘাতের চিহ্ন রয়ে গেছে। বিকেল ৩:৩০ নাগাদ প্রচুর গুলিবর্ষণ হয়। কেউ একজন পড়ে যায়। রক্ত ঝড়ছিল। আমি তাকে দেখতে এগিয়ে গেলাম। ছেলেটির [মাহামুদুর রহমান সৈকত] মাথা থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। সে নড়তে পারছিল না। আমরা বুঝতে পারলাম এগুলো পাখি মারার গুলি ছিল না। এগুলো ছিল তাজা বুলেট। আমরা তাকে রাস্তার পেছনে আনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে নড়তেও পারছিল না এবং কথাও বলতে পারছিল না। সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

ঢাকায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের একজন ছাত্র Fortify Rights কে জানান, কীভাবে তিনি ১৯ বছর বয়সী মাহামুদুর রহমান শৈকতের মৃত্যুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন:

> [মাহামুদুরের] মাথার ঠিক মাঝখানে গুলি লেগেছিল। যখন আমরা তাকে মাটি থেকে তুললাম, তখন সে আর নড়াচড়া করছিল না। সে ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিল। আমি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই, তারপর আবার আন্দোলনে ফিরে আসি। পথে কিছু লোক আমাকে থামায়। আমি রক্তে ভিজে ছিলাম। তারা জানতে চায় কেন আমি রক্তে ভেসে যাচ্ছি এবং বলে, 'তুমি কি আন্দোলনের নেতা?' তাদের হাতে লাঠি ছিল, এবং তারা আমাকে হুমকি দেয়। তারা আওয়ামী লীগের লোক ছিল। তবে শেষে তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি একটি মসজিদে গিয়ে জামাকাপড় ধুয়ে রক্ত মুছে ফেলি।

শৈকতের আত্মীয়রা Fortify Rights কে জানিয়েছেন, ২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তারা পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে বিতাড়িত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আরও ১১ জনকে দায়ী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। Fortify Rights অভিযোগটির কপি সংগ্রহ করেছে।

শৈকতের এক আত্মীয় বলেন, "যে এই হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, তাকে শৈকতের মৃত্যুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে।"

Fortify Rights ঢাকার একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। আন্দোলনে আহত কয়েকজন এখনও সেখানে চিকিৎসাধীন। সেখানে **Fortify Rights** ছয়জন গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯ বছর বয়সী এক মাছ ব্যবসায়ী বর্ণনা করেন, ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকায় একজন আহত যুবককে সাহায্য করার চেষ্টা করলে পুলিশ কীভাবে তার পায়ে গুলি করে। তিনি বলেন:

> পুলিশ প্রায় ৭০ থেকে ১০০ মিটার [প্রায় ২৩০ থেকে ৩২৮ ফুট] দূর থেকে গুলি চালানো শুরু করে। আমি পালানোর চেষ্টা করি। তাদের কাছে শর্টগান এবং রাইফেল ছিল। পুলিশ জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছিল। আমি একটি গলিতে আশ্রয় নিই। তখনও গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমার কান ফেটে যাবে।... আমি এক কিশোরকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখি। ছেলেটি স্কুল পড়ুয়া বয়সের। আমি তাকে পানি দিলাম। আমি তার মাথা ধরে রাখি।... আমরা যে রাস্তায় ছিলাম সেখানে পুলিশকে আসতে দেখি। বন্দুক হাতে নিয়ে তারা আমাকে চিৎকার করে থামতে বলে। আমি অনুরোধ করলাম, 'আমাকে শুধু তাকে একটু পানি দিতে দিন।' তখন পুলিশ আমাকে লাথি মারে। আমাকে লাথি মারলে, ছেলেটি শক্তি সঞ্চয় করে মাটি থেকে একটি ইট তুলে পুলিশকে ছুঁড়ে মারে। পুলিশ ঠিক আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক তখনই পুলিশ তাকে সরাসরি মাথায় গুলি করে। এটা ছিল শটগানের গুলি। সেখানেই তাকে হত্যা করা হয়। তার মাথার খুলির হাড় আমার পায়ে এসে লাগে। মস্তিষ্ক এবং রক্ত চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

লোকটি আরও বলেন, "ছেলেটিকে গুলি করা পুলিশ সদস্যটি আমার পায়েও গুলি করেছে। শুধু তাই নয়, পুলিশটি আমাকে গুলি করেই ক্ষ্যান্ত হোননি, আমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতও করেছে। নিজের হেলমেট খুলে আমার শরীরে আঘাত করেছে।"

স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসলে পুলিশ আহত লোকটি এবং নিহত ছাত্রের মরদেহ ঘটনাস্থলে রেখেই চলে যায়। সাক্ষাৎকারের সময় লোকটি জানান, তার পায়ে ছয়বার অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। রাতে ঘুমাতে পারি না। ছোট ছেলেটির মুখ আমার স্মৃতিতে বারবার ফুটে উঠে।"

Fortify Rights ঢাকায় বেশ কয়েকটি হত্যার ঘটনার নথি পর্যালোচনা করেছে। সেখানে দেখা গেছে, পুলিশের হাতে নিহত মরদেহগুলোকে কর্তৃপক্ষ কয়েকদিন আটকে রেখেছিল। উদাহরণ হিসেবে, ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি তার ১৯ বছর বয়সী ভাগ্নে মারুফ হোসেনের মরদেহ পাওয়ার জন্য তিন দিন লড়াই করেন। মারুফকে ১৭ জুলাই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আন্দোলনের সময় পুলিশ পেটে গুলি করেছিল। ভাগ্নের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে লোকটি বলেনঃ

> আমি তীব্র গুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আমি আমার ভাগ্নের কাছেই ছিলাম। হঠাৎ দেখি, সে সামনে লুটিয়ে পড়ল। আমাকে দেখেই সে বলল, 'চাচা, আমাকে বাঁচাও। আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছি।' প্রথমে বুঝতে পারিনি সে কোথায় আঘাত পেয়েছে। তখন তার শার্ট এবং ট্রাউজার খুলে ফেলি। পেটে বড় একটি গর্ত। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আমি তাকে তুলতে চেষ্টা করলাম। ক্ষতস্থানটি চেপে ধরলাম। কিন্তু গর্তটা বেশ বড় হওয়ায় কিছুতেই সামলাতে পারছিলাম না। আমরা আমাদের জীবিত ভাগ্নেকে হাসপাতালে আগে নিয়ে যেতে একটি অ্যাম্বুলেন্সকে অনুরোধ করলাম, কারণ গাড়ির ভিতরে একটি মরদেহ ছিল।

তবে মারুফ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা যায়। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় মরদেহ নিতে গেলে কী ঘটে সে বিষয়ে তাঁর চাচা ব্যাখ্যা করে বলেনঃ

> রাত ১১টার দিকে, মর্গের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা মরদেহ হস্তান্তরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি একটি ফোনকল পান। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, পুলিশ ছাড়পত্র ছাড়া কোনো ছাত্রের মরদেহ হস্তান্তর করা যাবে না। আমরা মরদেহ ছাড়াই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হই।

পরদিন সকালে তিনি BRAC বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী থানায় গেলে পুলিশের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে **Fortify Rights** কে বর্ণনা করেন। পুলিশ তাকে বলে, "আমাদের থানার কোনো গুলিতে কেউ মারা যায়নি। এখানে কোনো মরদেহও নেই। তাই আমরা আপনাকে পুলিশ ছাড়পত্র দিতে পারব না। ছাড়পত্রের জন্য আপনি রামপুরা থানায় যান।"

রামপুরা থানার পুলিশ প্রথমে তাকে শাহবাগ থানায় পাঠায়, উল্লেখ করে যে ঘটনাটি তাদের অধিক্ষেত্রে পড়ে না। কিন্তু শাহবাগ পুলিশ জানায়, তারা শুধুমাত্র ঢাকার বাইরের মরদেহ নিয়ে কাজ করে। ফলে লোকটি আবার রামপুরা থানায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার কাছ থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হন এবং হাসপাতালের মর্গে ফেরত যান। মর্গে ঘটে যাওয়া জটিলতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেনঃ

> [মর্গের কর্মকর্তারা] আমাদের আত্মীয়কে শনাক্ত করার জন্য মর্গে যেতে বলেন। সেখানে মরদেহগুলো একসঙ্গে স্তূপ করা ছিল। আমার ভাগ্নে আটটি মৃতদেহের নিচে পড়ে ছিল। আমরা তার পায়ের একটি দাগ দেখে তাকে শনাক্ত করি। তার বাবা দাগটি চিনতে পারেন। কিন্তু যখন [মর্গ কর্মকর্তারা] মৃত্যু সনদে 'ছাত্র' শব্দটি দেখেন, তখন তারা আবার জানিয়ে দেন যে মরদেহ ছেড়ে দেওয়া যাবে না এবং তাদের সুপারভাইজারের অনুমতি নিতে হবে।... সুপারভাইজারের সঙ্গে কথা বলার পর মুক্তির অনুমতি পাওয়া যায়। তবে তারা আবার দাবি করে, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত মরদেহ ছাড়া যাবে না। আর তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত [কর্মকর্তা] ইতিমধ্যেই সেদিনের কাজ শেষ করে চলে গেছেন। ফলে আমরা পরদিন ফিরে যাই। কিন্তু তখন আমার ভাগ্নের মরদেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও অন্য মরদেহগুলো তখনও সেখানে ছিল।

পরিবারটি অবশেষে ২২ জুলাই ঢাকার অন্য একটি মর্গে মারুফ হোসেনের মরদেহ খুঁজে পায় এবং সংগ্রহ করে। তার মৃত্যুর ছয় দিন পর তারা মরদেহ নিতে সক্ষম হয়।

এমনই আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেন ঢাকার ৫০ বছর বয়সী একজন বাসিন্দা। তিনি জানান, কীভাবে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের একই মর্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার ভাইয়ের মরদেহ হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯ জুলাই, পুলিশ তার ৪৫ বছর বয়সী ভাই আব্দুল হুদুদ আকনকে মাথার পেছনে গুলি করে। ঘটনাটি ঘটে যখন তিনি আন্দোলনস্থান পেরিয়ে কাছের একটি মসজিদে নামাজ পড়ে তার দর্জির দোকানে ফিরছিলেন। পরে তিনি ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে মারা যান। মহিলাটি বলেন, দুই দিন ধরে পরিবারের অনুরোধ উপেক্ষা করে মর্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশের অনুমতি ছাড়া মরদেহ ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি আরও জানানঃ

"থানায় অনুমতিপত্র নিতে গেলে, আমাদের একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয় যে আমাদের আত্মীয় পুলিশের গুলিতে নিহত হননি, বরং তাকে আন্দোলনকারীরা হত্যা করেছে।"

Fortify Rights ঢাকার বাইরে, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে নিরাপত্তা বাহিনী এবং সশস্ত্র সরকারপন্থী পাহারাদারদের হাতে মারাত্মক ও অতিরিক্ত বল প্রয়োগের আরও কয়েকটি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে।

চট্টগ্রাম শহরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়া হিসেবে, **Fortify Rights** জানায় যে শাসক দল আওয়ামী লীগের সদস্যরা–তাদের ছাত্র শাখা, ছাত্রলীগসহ–চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীর সাথে মিলে দমন-পীড়নের জন্য দায়ী। ১৬ জুলাই ২০২৪, একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে, আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের সদস্যরা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিবাদকারীদের একটি সমাবেশে গুলি চালায়, যাতে নিহত হন দুই ছাত্র–ওয়াসিম

আকরাম, ২২ বছর, এবং ফয়সাল আহমেদ শান্ত, ২১ বছর–এবং নোয়াখালী জেলার একজন কাঠমিস্ত্রি, ফারুক, ৩২ বছর।

ওয়াসিম আকরামের হত্যার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছে Fortify Rights । ২৬ বছর বয়সী একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান:

> [ওয়াসিম আকরাম] ১৬ জুলাই ছাত্রলীগের গুলিতে নিহত হয়। এটি আমার চোখের সামনেই ঘটেছে।... আমি ভালভাবে শুনতে পারছিলাম না। গুলি লাগার সাথে সাথে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। আমি তাকে জনতার মধ্যে বসে পড়তে দেখেছি। তখন ছাত্রলীগের সদস্যরা তাকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে। গুলি লেগে আহত হওয়ার পরও তাকে লাঠি দিয়ে পেটানো হচ্ছিল। গুলির আঘাতে সে পালাতে পারেনি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ২৮ বছর বয়সী আরেক সদস্য, যিনি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন:

> [ছাত্রলীগ] শুধু ওয়াসিমকে গুলিই করেনি, তাকে লাথি, ঘুষি ও কাঠের লাঠি দিয়ে মারধরও করেছে। পরে ওয়াসিম ঘটনাস্থলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে।... আমি ওয়াসিমকে কাঠের লাঠি দিয়ে পেটাতে দেখেছি। ... প্রায় ১৫ জন ছাত্রলীগ সদস্য তাকে মারধর করছিল। আমরা তাদের ধাওয়া করলে তারা ওয়াসিমকে রেখে পালিয়ে যায়।

তিনি আরও জানান, নুরুল আজিম রনি, আওয়ামী লীগের সদস্য ও চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, এবং হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক সদস্য, সেদিন প্রতিবাদকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বলেন:

> আমি ওয়াসিমের মৃতদেহ থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ ফুট দূরে ছিলাম। ... নুরুল আজিম রনি এবং বাবর বেশিরভাগ গুলি চালিয়েছিলেন। ... এটা আমি নিজ চোখে দেখেছি। তাদের কাছে শটগান ছিল, আর বাবরের কাছে একটি পিস্তলও ছিল। ...[ওয়াসিম আকরামের] শরীরের একাধিক স্থানে গুলি লেগেছিল, তার পা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

২৮ বছর বয়সী এই প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ বাহিনীর সম্পৃক্ততার কথাও তুলে ধরেন: "ওয়াসিমকে গুলি করার সময় পুলিশ বাহিনী ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের সদস্যদের সঙ্গে ছিল। তারা আমাদের দিকে প্রচুর টিয়ার গ্যাসের ক্যানিস্টার ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। টিয়ার গ্যাসের কারণে শ্বাস নিতে আমরা হিমশিম খাচ্ছিলাম।"

ওয়াসিম আকরামের মৃত্যুর পর, চট্টগ্রামে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সমন্বয়ক ফেসবুকে লিখেন: "[নুরুল আজিম] রনি চট্টগ্রামের ছাত্রদের ওপর এই বর্বরোচিত হামলা এবং অধিকাংশ গুলির ঘটনার প্রধান অপরাধী। তাকে আটক করুন।" ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, চট্টগ্রামের একজন বাসিন্দা হেলাল আকবর চৌধুরী বাবরের বিরুদ্ধে সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা করেন। এর আগে, আগস্টে, ঢাকার বিমানবন্দরে নুরুল আজিম রনিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

Fortify Rights আরও নথিভুক্ত করেছে, কীভাবে ১৬ থেকে ১৮ জুলাই এবং ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কক্সবাজারে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সদস্যরা শান্তিপূর্ণ ছাত্র আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে বার্ডশট - একধরনের ছোট ক্যালিবার শটগানের গুলি - ছুড়েছিল, যাতে অনেক আন্দোলনকারী আহত হন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কক্সবাজার সরকারি কলেজের ২৩ বছর বয়সী এক ছাত্র, ১৮ জুলাই লালদিঘির পাড় রোডে একটি প্রতিবাদের সময় বার্ডশটের গুলিতে চোখে আঘাত পাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন:

> আমি দেখেছি পুলিশ সামনে থেকে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। ... আমি প্রথম সারিতে ছিলাম, তাই আমি সহজেই তাদের দেখতে পেরেছিলাম। তারা পুলিশের পোশাক এবং হেলমেট পরেছিল। কিছু পুলিশ লাঠি বহন করছিল, অন্যদের কাছে রাবার বুলেট ও বার্ডশট বন্দুক ছিল। হ্যাঁ, তারা তাদের বন্দুক ব্যবহার করেছিল। আমাদের সামনে এবং পেছনে পুলিশ ছিল। প্রথমে পুলিশ আমাদের আশ্বস্ত করেছিল যে কিছুই হবে না, কিন্তু পরে তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়।... গুলিবিদ্ধ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই। আমার বন্ধুরা আমাকে দুপাশ থেকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যায়, আর আমি পুরো সময় জ্ঞান হারাইনি। আমাকে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।

কক্সবাজারের আরেক ছাত্র **Fortify Rights** কে ১৮ জুলাই একটি প্রতিবাদের সময় গুলিবিদ্ধ হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন:

> আমি [বার্ডশট] গুলিতে আঘাত পেয়েছিলাম। এটি আমার ডান দিকে লেগেছিল। আমাকে চট্টগ্রাম হাসপাতালে নিতে হয়েছিল। গুলি আমার হাড়ে লেগেছিল। এটি দূর থেকে ছোঁড়া হয়েছিল. ... [পুলিশ এবং আওয়ামী লীগ] টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করেছিল। এটি ছিল একটি যৌথ বাহিনী যারা আমাদের ওপর হামলা করেছিল। [বার্ডশট] গুলি আসছিল আওয়ামী লীগ ও পুলিশের দিক থেকে। তাদের কাছে প্রায় ১০০ জন পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সদস্য ছিল।

প্রতিবাদের পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন: "আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিলাম... [পুলিশ] আমাদের প্রতিবাদ

থামানোর জন্য কোনো হুশিয়ারি দেয়নি। হঠাৎ করেই তারা জনতার মধ্যে রাবার বুলেট ও [বার্ডশট] গুলি ছুঁড়তে শুরু করে।"

৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর কক্সবাজারে আরও হামলার ঘটনা নথিভুক্ত করেছে **Fortify Rights** । কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ২২ বছর বয়সী এক ছাত্র বলেন:

> প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের দিন, ৫ আগস্ট আমি [আসল গুলিতে] গুলিবিদ্ধ হয়েছিলাম. ... আমরা কালুর দোকান [রোড] দিয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাচ্ছিলাম। বিরোধীরা কক্সবাজারের ঘুম গাছ তলা এলাকা থেকে আমাদের দিকে অন্ধভাবে গুলি চালাচ্ছিল। আমি সমাবেশের সামনে ছিলাম। গুলি চালানোর সময় আমরা নিরাপদ স্থানে চলে যাই। আমার পা ব্যথা করছিল। যখন আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার প্যান্ট রক্তে ভিজে গেছে, তখন আমি অজ্ঞান হয়ে যাই, এবং আমার বন্ধুরা আমাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন বিকেল হয়ে গেছে, প্রায় ৫:১৫টা। যখন আমি জ্ঞান ফিরে পাই, আমি আমার পরিবারকে হাসপাতালে আমার পাশে দেখতে পাই।

তিনি অপরাধীদের শনাক্ত করতে পারেননি, তবে উল্লেখ করেছেন, "আমি বিক্ষোভে কোনো পুলিশ দেখিনি," যা ইঙ্গিত দেয় যে আওয়ামী লীগের সদস্যরা গুলি চালানোর জন্য দায়ী হতে পারে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে, বাংলাদেশ বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২০ নং অনুচ্ছেদ এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত চুক্তির ২১ নং অনুচ্ছেদে স্বাক্ষরকারী হওয়ায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ নং অনুচ্ছেদও প্রতিটি নাগরিককে "শান্তিপূর্ণভাবে এবং অস্ত্র ছাড়া জনসভা ও মিছিলে অংশগ্রহণের অধিকার" প্রদান করে, তবে "যে কোনও যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আইন দ্বারা আরোপিত হতে পারে, যা জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয়।" আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একটি সমাবেশ শান্তিপূর্ণ বলে গণ্য হবে যদি তার সামগ্রিক প্রকৃতি শান্তিপূর্ণ হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের প্রতিবাদসমূহ এই মানদণ্ড পূরণ করে।

আন্তর্জাতিক আইন আরও বলে যে পুলিশ শুধুমাত্র তখনই বল প্রয়োগ করবে যখন তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবে এবং তা আইনসম্মত এবং সঙ্গতিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হবে। জাতিসংঘের আচরণবিধি অনুসারে, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যে তারা "কেবল তখনই বল প্রয়োগ করবেন যখন তা কঠোরভাবে প্রয়োজনীয় এবং তাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে"।

বল এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মূলনীতিতে আরও উল্লেখ করে যে, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা প্রথমে অহিংস পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এবং যখন বল প্রয়োগ অপরিহার্য, তারা "সংযম অবলম্বন করবেন এবং অপরাধের গুরুত্ব ও বৈধ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুপাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।" আরও বলা হয়েছে, মূলনীতি ৯ অনুসারে:

> আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবেন না, কেবল আত্মরক্ষার জন্য বা অন্যদের মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আসন্ন হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য, জীবনকে গুরুতর হুমকি প্রদানকারী বিশেষ গুরুতর অপরাধ সংঘটন রোধ করার জন্য, বিপদ সৃষ্টিকারী এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রতিরোধকারী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার জন্য, অথবা তার পলায়ন রোধ করার জন্য, এবং কেবল তখনই যখন কম তীব্র উপায়ে এই লক্ষ্যগুলি অর্জন সম্ভব না হয়। কোনও পরিস্থিতিতেই, আগ্নেয়াস্ত্রের মারাত্মক ব্যবহার কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন জীবন রক্ষা করার জন্য তা অত্যন্ত অনিবার্য।

উল্লেখযোগ্যভাবে, "অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অন্য কোনও জরুরি অবস্থা এই মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।"

মূলনীতির অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের "বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র এবং গোলাবারুদ" সরবরাহ করা উচিত, যা বল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে সক্ষম, এবং এর মধ্যে "অপ্রাণঘাতী অক্ষমতাযুক্ত অস্ত্র" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে বার্ডশট, রাবার বুলেট এবং টিয়ারগ্যাস হতে পারে। তবে, মূলনীতির উপর ভিত্তি করে, এসব অস্ত্র কেবলমাত্র "উপযুক্ত পরিস্থিতিতে" ব্যবহার করা উচিত এবং "অংশগ্রহণকারীদের ঝুঁকি কমানোর জন্য সতর্কভাবে মূল্যায়ন" করা প্রয়োজন, পাশাপাশি সেগুলি "যত্ন সহকারে নিয়ন্ত্রণ" করা উচিত। অহিংস সমাবেশের ক্ষেত্রে, মূলনীতির নির্দেশিকা অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের "বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে অথবা যদি তা সম্ভব না হয়, তবে বল প্রয়োগের পরিমাণ সর্বনিম্ন রাখতে হবে।"

মূলনীতির পরিপন্থীভাবে, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য এবং ফোর্টিফাই রাইটসের নথিভুক্ত আঘাতগুলি প্রমাণ করে যে পুলিশ বাহিনী এবং সরকারপন্থী পাহারাদাররা শুধু বল প্রয়োগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং প্রতিবাদকারীদের মাথা ও মুখে গুলি করেছে, যার ফলে অপ্রাণঘাতী অস্ত্র থেকেও মারাত্মক ও গুরুতর আঘাত হয়েছে।

আগস্ট ২০২৪ সালে, অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক অনুরোধের পর, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের অফিস একটি তথ্য অনুসন্ধান মিশন গঠন করে যাতে "তথ্য সংগ্রহ, দায়িত্ব নির্ধারণ, মূল কারণ বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের অতীত

লঙ্ঘনগুলো মোকাবেলা করার জন্য এবং পুনরাবৃত্তি রোধে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সুপারিশ" প্রদান করা হয়।

অক্টোবর ২০২৪ সালে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল–যা বাংলাদেশে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তি বিরোধী অপরাধ বা গণহত্যা সংঘটিত করার জন্য "কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বিচার ও শাস্তি দেওয়ার" জন্য প্রতিষ্ঠিত–জুলাই এবং আগস্ট ২০২৪ এর গণপ্রতিবাদে "হত্যাযজ্ঞ, হত্যাকাণ্ড এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ" সংঘটিত করার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা এবং ৪০ জনেরও বেশি অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম ঘোষণা করেন যে "শহীদ" বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নিহত সদস্যদের পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা (প্রায় ৮৮,০০০ মার্কিন ডলার) প্রদান করা হবে।

Fortify Rights জানিয়েছে যে দাতা সরকারগুলিকে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে হবে, যাতে দোষীদের দায়বদ্ধ করা যায় এবং আহতদের ও নিহতদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হয়।

John Quinley বলেছেন, "জুলাই এবং আগস্টের সহিংসতার শিকার বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা এবং নিহতদের পরিবার সত্য, ন্যায়বিচার এবং সমর্থনের অধিকারী। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্কারের জন্য বড় পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এটি সম্ভব, তবে তা কেবলমাত্র পুরনো সরকারের অধীনে ঘটে যাওয়া লঙ্ঘনের জন্য দায়বদ্ধতা ও ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে।"

পটভূমি:

২০২৪ সালের জুলাই মাসের শুরুতে, বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের সরকারি চাকরির জন্য কোটা পুনঃস্থাপন সংক্রান্ত রায়ের পর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ শুরু করে। বিশেষভাবে, রায়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের কথা বলা হয়। জুলাই এবং আগস্ট মাসে, আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে পরিণত হয়।

২০২৪ সালের ৪ আগস্ট, শেখ হাসিনা তার সমর্থকদের "নৈরাজ্যবাদীদের নির্মমভাবে দমন করার" আহ্বান জানান। এর পরের দিন, ৫ আগস্ট, হাসিনা সেনাবাহিনীর প্রতিবাদ দমনে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানালে দেশ ত্যাগ করেন।